করোনাভাইরাস-১৯: সম্ভাব্য অনিশ্চয়তা ও করণীয় কল্পচিত্র

আবুল বারকাত
অধ্যাপক, অর্থনীতি ও জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(email: barkatabul71@gmail.com)

খোলা চোখে অদৃশ্যমান আকার-আয়তনে এত ক্ষুদ্র একটা জিনিস যে বিশ্বের প্রায় সব মানুষকে এতটা দৃশ্যমান অসহায় করতে পারে তার চাক্ষুষ প্রমাণ করোনাভাইরাস-১৯ বা কোভিড-১৯। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আমার মত সামাজিক বিজ্ঞানীর পক্ষে মন্তব্য করা ধৃষ্টতা এবং তা যথেষ্ট বিজ্ঞানম্মত নাও হতে পারে। আর সে কারণেই করোনাভাইরাস-১৯ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক ধারণাটা বলে রাখা প্রয়োজন। ধারণাটা এরকম: আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একটা সিস্টেম আছে যাকে বলা হয় ইমিউন সিস্টেম। এ সিস্টেমকে তুলনা করা চলে বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনীর সাথে। এ বাহিনীর কাজ হল হয় কোনো শত্রুকে শরীরে ঢুকতে না দেয়া অথবা ঢুকলেও তাকে বাড়াবাড়ি করতে না দেয়া, ক্ষতি করতে না দেয়া, অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। কিন্তু করোনাভাইরাস এক মহাধড়িবাজ শত্রু যে অতি সন্তর্পনে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুবেশে আমাদের দেহে অনুপ্রবেশ করে – মুখ, নাক, চোখ দিয়ে। করোনার চারপাশে একটা দেয়াল বা পোশাক আছে। পোশাক পরা অবস্থায় সে যথেষ্ট ভদ্রলোক। ধড়িবাজ এ ভদ্রলোকটি আশ্রয় নেয় আমাদের দেহের কোষে। থাকে সুযোগের অপেক্ষায় কখন সে আমাদের দেহকোষে ঢুকে তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সুইচ অন করবে। এ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পাওয়া মাত্রই একসময় তার পোশাকের মধ্যে যে আরএনএ ভাইরাস আছে তা বিস্তারের জন্য সে সুইচ অন করে। তখনই চালু হয়ে যায় ধড়িবাজ করোনাভাইরাস-এর সংখ্যা বৃদ্ধি। এক পর্যায়ে সংখ্যা এতই বাড়ে যে আক্রান্ত কোষগুলো ভাইরাসকে ধারণ করার ক্ষমতা অতিক্রম করে এবং কোষটি ফেটে যায়। এভাবে এক একটা করোনাভাইরাস থেকে তৈরি হয় লক্ষ লক্ষ করোনাভাইরাস। আর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে দ্রুত জন্ম নেয় কোটি কোটি কোটি করোনাভাইরাস, এবং আক্রমণ করে সে আমাদের শ্বাসতন্ত্রকে। এক পর্যায়ে শ্বাসতন্ত্র তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করতে অক্ষম হয়ে যায়; বিকল হতে থাকে শ্বাসতন্ত্রের পুরো যন্ত্রটি। এরপর হয় অসুস্থতা আর শ্বাসতন্ত্র দুর্বল হলে আশঙ্কা থাকে মৃত্যুর।

বিজ্ঞানীরা এ ভাইরাসে আক্রান্ত অথবা আক্রান্ত-সম্ভাব্যদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ভ্যাকসিন আবিষ্কার, চিকিৎসা, আক্রান্ত-সম্ভাবনা কমিয়ে আনা, বিস্তার রোধ, উৎপত্তির কারণ, ভাইরাস বিস্তার রোধের পথ-পন্থা উদ্ঘাটন থেকে শুরু করে ক্ষতি হ্রাস কৌশল নিয়ে দিবানিশি কাজ করছেন। সিরিয়াস সমাজচিন্তক বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন 'করোনাভাইরাস-১৯' হলো "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"। কথাটি বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু যেটা দিবালোকের মতো সত্য, সার্বজনীন সত্য, নিরঙ্কুশ সত্য তাহলো এ ভাইরাস আমাদের জন্য সাধারণ কোনো ঝুঁকি বা রিস্কের কারণ নয়, এ ভাইরাস আমাদের জন্য– বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য নিরঙ্কুশ অনিশ্চয়তা বা আনসাইর্টেনিটির কারণ। কারণ যদি শুধু ঝুঁকি হতো তাহলে আমরা ঝুঁকির বিভিন্ন দিক পরিমাপ করতে পারতাম এবং সে মাফিক সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিতে পারতাম। কিন্তু অনিশ্চয়তা তো মাপজোক করা যায় না; আর তাই অনিশ্চয়তার বিভিন্ন দিক মোকাবেলার বিজ্ঞানসম্মত পথ-পদ্ধতি বাতলানোও সম্ভব নয়– এসব নিয়ে পরীক্ষিত কোনো তত্ত্বও নেই। তবে আমার মতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার এক বা একাধিক সিনারিও বা কল্পচিত্র বিনির্মাণ করে প্রতিটির বিপরীতে সম্ভাব্য সমাধান চিত্র আঁকতে হবে। এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রে যে তত্ত্ব সব চেয়ে বেশি কার্যকর হতে পারে তা হলো শক্তিশালী 'সাধারণ জ্ঞান' বা কমনসেন্স। তবে বলে রাখি এ ধরনের কমনসেন্স যথেষ্ট আনকমন। আর বিষয়টা যখন বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস-১৯ তখন তা আরও অনেকগুণ বেশি প্রযোজ্য। এটাও সত্য যে খণ্ড চিত্র পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয় আবার খণ্ডচিত্র নির্ভর উপসংহার হতে পারে

যথেষ্ট মাত্রায় বিভ্রান্তিকর অর্থাৎ বিষয়টিকে সমগ্রকতার নিরিখে দেখতে না পারলে সমাধানের কল্পচিত্রও হবে খণ্ডিত। এটাও বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা।

করোনাভাইরাস-উদ্ভূত অনিশ্চয়তা এবং সমাধানের লক্ষ্যে উত্থাপিত কল্পচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজস্ব ভাবনা। কোনো প্রমাণিত তত্ত্ব অথবা প্রাক-অভিজ্ঞতা উদ্ভূত নয়। তবে সমাধান-উদ্দিষ্ট ভাবনার পেছনে বেশ কিছু যুক্তি আছে যা পরে বলেছি।

আমার মূল বক্তব্যটি এরকম: বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে হবে এবং তা সম্ভব; ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব।

কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধে এখন পর্যন্ত ভাইরাস-আক্রান্ত রুগী নির্ণয় বা ডিটেকশন, সঙ্গরোধ বা কোয়ারেনটাইন, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলা, সামাজিক মেলামেশা বন্ধ করা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরলস শ্রম—আর এসবের পাশাপাশি ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ও চিকিৎসা সহায়তা—সম্মিলিতভাবে এসবই একদিকে যেমন দেশে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এবং অবস্থান-ঠিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্যচিত্র দেবে তেমনি তা করতে পারলে এমন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে যার ফলে রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে অথবা বিস্তার-গতি কমবে। অর্থাৎ বিস্তারের ঊর্ধ্বমুখী গতিপথ নিঃসন্দেহে নিম্নমুখী হবে।

একটি বিষয়ে বিজ্ঞানিদের কোনো দ্বিমত নেই যে, যে কোনোভাবেই হোক না কেন আক্রান্ত মানুষের নিরঙ্কুশ সংখ্যাকে কমিয়ে আনতে হবে। আসলে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাটা কত হলে 'কম' বলা যাবে তা নিয়ে মতানৈক্য স্বাভাবিক। কারণ প্রতি একলক্ষ মানুষের মধ্যে ১০জন আক্রান্ত হলে রোগতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আক্রান্ত 'কম' নাকি 'সহনীয়' নাকি 'বেশি'? সম্ভবত রোগতত্ত্ব বিশেষজ্ঞেরা এ প্রশ্নের সম্ভাব্য সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। তবে আমাদের মতো আমজনতা যুক্তি দেখাতে পারে যে ঐসব 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি' নির্ভর করতে পারে জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর। অর্থাৎ ঢাকার ছোট একটা বস্তিতে যেখানে মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করেন সেখানে ঐ সংখ্যাটি 'বেশি'। আর যেখানে একলক্ষ মানুষ দশ বর্গকিলোমিটারে মোটামুটি সমান দূরত্বে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করছেন সেক্ষেত্রে ঐ একই সংখ্যাটি 'কম' বলে বিবেচিত হলেও হতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো কোথায় কতটুকু জোর দিতে হবে। সেইসাথে এ কথাও বলতে পারবো যে একই দেশের মধ্যে মানুষ চলাচলে কোথাও কোথাও একধরনের বর্ডার বা বেড়াজাল বানাতে হবে—অস্থায়ীভাবে হলেও। আর যদি ঐ বিস্তার-এর সাথে 'কম', 'সহনীয়', 'বেশি'-র কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে জোর দিতে হবে সর্বত্র। সেক্ষেত্রে সম্পদও সে অনুযায়ী বেশি লাগবে। এসব নিয়ে আমার ব্যক্তিগত মত হলো "কম-সহনীয়-বেশি"— এসব বিবেচনা যতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তার চেয়ে বহুশতগুণ গুরুত্বপূর্ণ হলো রোগের বিস্তার রোধ করতে হবে এবং বিস্তার-গতি কমাতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন হবে আত্মঘাতী।

আগেই বলেছি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা হতে হবে সম্মিলিত উদ্যোগে। তবে বিষয়টি যেহেতু মহামারি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা সেহেতু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর সেক্ষেত্রে প্রচলিত গতানুগতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অথবা অসমন্বিত ব্যবস্থাপনা অথবা বহু অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্বলিত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ফল কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্যকর হবে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কঠোর ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসরণ করা—যা প্রচলিত গতানুগতিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

কঠোর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মত হলো পৃথিবীর অন্যান্য সফল দেশের মতো আমাদের দেশেও কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য মূল দায়িত্ব দিতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন জ্ঞানসমৃদ্ধ দেশপ্রেমিক ব্যক্তিকে যিনি জনগণের পক্ষে সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি হবেন আর অন্যসব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর থাকবে একক দায়িত্বপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তির অধীন এবং সম্পূর্ণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সমন্বয় ও পরিচালনের জন্য তিনি জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সি বিবেচনায় প্রয়োজনে সেনাবাহিনীসহ আইন-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকলের নিঃশর্ত সর্বাত্মক সহায়তা নেবেন। এ যুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হবেন চিফ অব কমান্ড আর একক দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। এর কোনো বিকল্প নেই।

করোনাভাইরাস-১৯ একদিকে যেমন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে না, ঠিক অন্যদিকে করোনাভাইরাস-এর বিস্তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে রোধ হবে না। মনে রাখা দরকার যে বিশ্বে করোনাভাইরাস-১৯ এ যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রথম ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন প্রথম ৬৭ দিনে, পরবর্তী ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী ১৪ দিনে, তার পরের ১ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন পরবর্তী মাত্র ৪ দিনে। এ তথ্যই বলে দিচ্ছে যে, কোনো সময়ক্ষেপণ না করে প্রতিরোধ বেড়াজাল তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে। ইতোমধ্যে যেসব দেশ কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পেরেছে তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। এ নিয়ে খুঁটিনাটি বিষয়াদি নির্ধারণ করবেন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিফ অব কমান্ড মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশনায় একক দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্ঞানসমৃদ্ধ-দেশপ্রেমিক ওই ব্যক্তি যিনি হবেন চিফ অব অপারেশনস, যার অধীনস্থ হবে সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগ-দপ্তর-অধিদপ্তর-হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্র-ল্যাবরেটরি এবং তার হাতেই ন্যাস্ত থাকবে সর্বময় কর্তৃত্ব একইসাথে তার থাকবে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একগুচ্ছ নিবেদিতপ্রাণ উপদেষ্টা।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে কোনোরকম কালক্ষেপণ না করে সতেরো কোটি মানুষের আমাদের দেশে যা দরকার তা হল: পিসিআর বা পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন ম্যাসিনে মলিকুলার ডায়াগনোসিস এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রি-এজেন্ট যেন প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ হাজার টেস্ট করা সম্ভব হয় (এ মুহূর্তে আমাদের দেশের তুলনায় অর্ধেক জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে প্রতিদিন টেস্ট হচ্ছে ৭০ হাজার); দ্রুত বা র‍্যাপিড টেস্টের জন্য কমপক্ষে ২ লক্ষ রোগ নির্ণয় কিট– যে কিটের কার্যকারিতা ইতোমধ্যে শতভাগ প্রমাণিত (অর্থাৎ পরীক্ষামূলক কোনো কিট নয়); সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা, ল্যাব-বিজ্ঞানী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান-কর্মীবাহিনী নিয়োগ; নির্ণীত রুগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় ভেনটিলেটর, অক্সিজেন এবং গুরুতর রুগীর জন্য ডেডিকেটেড ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা আইসিইউ ব্যবস্থা; প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রুগীর লালা-রক্ত ইত্যাদি বহনের জন্য নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোল্ড চেইন ব্যবস্থা; দেশের ভেতরেই সংশ্লিষ্ট যেসব উপাদান-উপকরণ আছে তার পূর্ণ ইনভেনটরি; রোগতত্ত্বীয় ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ডাটা বেইজ প্রতিষ্ঠা ও তা সংরক্ষণের ত্রুটিহীন নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থা; হাসপাতাল-চিকিৎসাকেন্দ্রে রুগীদের ঢোকা এবং বেরুনোর জন্য রোগের ধরন অনুযায়ী (যাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে ইন এন্ড আউট)—সংক্রমিত রুগী, সংক্রমণ-সম্ভ্যাব্য রুগী, অসংক্রমিত রুগীর ঢোকার জন্য তিনটি ভিন্ন পথ আর বেরুনোর সময় সংক্রমিত রুগী ও অসংক্রমিত রুগীর জন্য দুটো ভিন্ন পথ; মানব স্বাস্থ্য, জীবজন্তু ও পরিবেশ স্বাস্থ্যের ডাটা ইন্টিগ্রেশনের ব্যবস্থা; জনস্বাস্থ্যের সাথে জন নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন; চিকিৎসক-স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের জন্য পরীক্ষিত নিরাপত্তা পরিধেয় এবং প্রণোদনাব্যবস্থা; কার্যকর সঙ্গরোধ ব্যবস্থা; স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিধি যে কোনো মূল্যে কঠোরভাবে পালনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা; সামাজিক মেলামেশা রোধ; ভাইরাস প্রতিরোধী সামাজিক আন্দোলন জোরদার করা; বিদেশ থেকে রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞ-ডাক্তার-নার্স আনা; অসংক্রমিত রোগ যেমন ক্যানসার, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস– যেসব রোগের চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে দেশে প্রতিবছর ৫০ লক্ষ অদরিদ্র মানুষ দরিদ্রদের কাতারে যুক্ত হচ্ছেন– এসব রোগের চিকিৎসা চালু রাখা; চালু রাখা গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর চিকিৎসা সেবা; গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখা যে করোনাভাইরাস আক্রান্ত মানুষের কো-মরবিডিটি অর্থাৎ অন্য রোগে আক্রান্ত মানুষ যদি করোনাভাইরাসের কবলে পড়েন সেক্ষেত্রে তার মৃত্যুসম্ভাবনা অথবা গুরুতর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা সাজানো। এককথায় দরকার হলো সমগ্র স্বাস্থ্য সেক্টর ও জনস্বাস্থ্য সেক্টরকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া ও সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়ে তোলা।

করোনাভাইরাস-১৯-এর বিস্তার রোধে যেসব কর্মকাণ্ডের কথা বললাম তা বাস্তবায়নে সম্পদ ব্যয় করতে হবে। অর্থ লাগবে। সম্ভাব্য কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ (ব্যয় নয়) করতে হবে এবং ওই অর্থ আহরণের উৎস কি হতে পারে? আগেই বলেছি হিসেবটি খন্ড চিত্রভিত্তিক নয় সমগ্রক চিত্র বিবেচনায় রেখেই করতে হবে। এ ধরনের কল্পচিত্র অনুযায়ী আমার হিসেবে প্রয়োজন হবে কমপক্ষে ১ লক্ষ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ অর্থ একইসাথে এখনই প্রয়োজন হবে না, কারণ বেশ কিছু জিনিষপত্তর যেমন রি-এজেন্ট, বেতন-ভাতা, পরিবহন ব্যয়– এসব সামনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাগবে। আনুমানিক ১ লক্ষ কোটি টাকার এ বিনিয়োগ কোথা থেকে আসতে পারে? আমার জানামতে বৈশ্বিকভাবে ইতোমধ্যে ২০

বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ তহবিল গঠন করা হয়েছে যা আক্রান্ত দেশগুলো ব্যবহার করবে, আর পাশাপাশি এ বাবদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, ট্রাস্ট ও চ্যারিটি সংস্থা। অর্থাৎ এ মুহূর্তে করোনা প্রতিরোধে বৈশ্বিক তহবিলে আছে কমপক্ষে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (এ অঙ্ক বাড়বে)। যৌক্তিক কারণেই বৈশ্বিক জনসংখ্যা অনুপাতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা হওয়া উচিত ওই ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কমপক্ষে ৩ শতাংশ। অর্থাৎ ন্যায্যত আমাদের পাওনা হতে পারে কমপক্ষে ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এ হিস্যা পেতে হলে প্রয়োজন হবে শক্তিশালী অতি জরুরি ফলপ্রদ কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রেও ভ্যানগার্ড হতে পারেন বিশ্ব সমাজে আদৃত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈশ্বিক তহবিল থেকে ওই অর্থ পাওয়া গেলে ঘাটতি থাকবে ৮৭ হাজার ২৫০ কোটি টাকা। ঘাটতি এ অর্থ পূরণের উৎস হতে পারে জরুরি অবস্থায় সম্পদশালীদের উপর কর অর্থাৎ ওয়েলথ ট্যাক্স আরোপ (৩০ হাজার কোটি টাকা), পাচারকৃত অর্থ ও কালো টাকা উদ্ধার (৬০ হাজার কোটি টাকা)। এখানে অর্থনীতিশাস্ত্রের কয়েকটি প্রমাণিত-পরীক্ষিত সত্য কথা উল্লেখ জরুরি: ওয়েলথ ট্যাক্স বৈষম্য হ্রাস করে; অর্থ পাচার ও কালো টাকা বৈষম্য বাড়ায়; সম্পদশালীদের উপর ট্যাক্স কমালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে না; সমাজের নীচতলার ৯০ শতাংশ মানুষের উপর ট্যাক্স কমালে তাদের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ে।

করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে এই ১ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ফল হবে বহুমুখী পজিটিভ—স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদেই। স্বল্প মেয়াদে আক্রান্ত মানুষ বাঁচবে, সংক্রমণ হার কমবে, সংক্রমণ বিস্তার রোধ হবে, কম্যুনিটিতে ছড়িয়ে যাওয়া কমবে, মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, মানুষের মানসিক দুশ্চিন্তা উদ্ভুত দুর্দশা কমবে, কো-মর্বিডিটি (সহ অসুস্থতা) কমবে একই সাথে কমবে সংশ্লিষ্ট মৃত্যু হার। আর দীর্ঘমেয়াদে লাভ হবে অনেক সুদূরপ্রসারী: ভাইরাস প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। সমগ্র স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে, বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্লোবাল হেলথ সিকিউরিটি ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী আমাদের অবস্থান বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১১৩তম, যেখানে রোগ প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সূচক জীবাণু বাহিত অসুখ-বিসুখ, বায়ো-সিকিউরিটি, বায়ো-সেফটি, জীবাণু কন্ট্রোল প্রাকটিস ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, স্বাস্থ্য সিস্টেম, র‍্যাপিড রেসপনস, রোগ নির্ণয় ও রিপোর্টিং—এসব সূচকে আমাদের অবস্থান বেশ তলার দিকে। ১ লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে উন্নততর করবে যার অভিঘাত হবে কল্পনাতীত পজিটিভ এবং বংশপরম্পরা। নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বলয় দৃঢ়তর হবার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্যসহ অর্থনৈতিক-সামাজিক বলয় সুসংহত হবে; দৃঢ়তর হবে সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যা সুশাসনের পূর্বশত; দুর্বল প্রতিষ্ঠান সবল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে যা টেকসই প্রবৃদ্ধি ও প্রগতি নিশ্চিত করার পূর্বশত; ভবিষ্যত প্রজন্মের স্বাস্থ্যের জন্য এ বিনিয়োগ হবে উপরি পাওনা অর্থাৎ তখন তাদের এ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন পড়বে না শুধু রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। এ বিনিয়োগ সুস্থ মানব সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি সুপ্রশস্থ করবে যা ভবিষ্যতে জন-সমৃদ্ধি ও মানবকুশলতা নিশ্চিত করবে। এক কথায় এ হল সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের আবশ্যিক বিনিয়োগ।

আসা যাক আমার দ্বিতীয় বর্গের বক্তব্যে যেখানে আমি বলেছি "ক্ষতি-সম্ভাবনা হয়তো বা অপরিমেয় কিন্তু ক্ষতি হ্রাস করতে হবে এবং সেটাও সম্ভব"। সম্ভাব্য অপরিমেয় ক্ষতিটা হতে পারে কিভাবে? মানুষের অকাল মৃত্যু ও বিভিন্ন মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতার কথা তো আগেই বলেছি— এসব হলো প্রথম ক্যাটাগরির ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির ক্ষতিটা হবে একই সঙ্গে পাশাপাশি তবে ক্ষতির রূপটা হবে ভিন্ন এবং সম্ভবত ক্ষতির গভীরতা হতে পারে কল্পনাতীত ও অপরিমেয়। বিষয়টার উদ্ভব হবে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা গতি স্লথ হয়ে যাবার কারণে। ইতোমধ্যেই আমরা এসব লক্ষ্য করছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাত্রায়: শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে (বিশেষত বস্ত্র, গার্মেন্টস, লেদার ইত্যাদি); বন্ধ হচ্ছে সব ধরনের ট্রান্সপোর্ট; বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাত— রিক্সা, ভ্যানসহ শহর-উপশহর-গ্রামের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা জীবিকা নির্বাহি কর্মকাণ্ড; বেকারত্ব বাড়ছে এবং বাড়বে—সর্বত্র; কৃষক কৃষিজ ফসল বিক্রির জন্য হাটবাজারে যেতে পারছেন না, কারণ

করোনার কারণে হাট বসতে দেয়া হচ্ছে না; বৈদেশিক বাণিজ্যে-আমদানি ও রপ্তানি উভয়ই কমছে; ইতোমধ্যে বস্ত্র ও গার্মেন্টসের প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার-এর ক্রয়াদেশ বাতিল হয়েছে; ব্যাংকের এলসি প্রায় স্থবির; প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ কমে আসছে– এসবই বড় ধরনের অনিশ্চয়তা এবং এ অনিশ্চয়তা কতদিন চলবে তা কেউই জানে না। আমার মতে এসব কারণে সবচেয়ে মারাত্মক যে বিষয়টা সমাগত– এপ্রিল-মে মাসের মধ্যেই সম্ভবত– তা হল হয়তো বা খাদ্যের পরিমাণে ঘাটতি থাকবে না কিন্তু গ্রাম-শহর নির্বিশেষে দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত মানুষের ঘরে খাবার থাকবে না, তারা সন্তান-সন্ততিসহ অভুক্ত-অর্ধভুক্ত থাকতে বাধ্য হবেন। কারণ যেসব মানুষ (খানা) 'দিন আনে দিন খায়' তাদের 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে গেলে তারা খাবেটা কি? আর কাজ না থাকলে তো 'দিন আনা' বন্ধ হয়ে যাবে।

এ এক সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা। পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো ক্ষুধার্ত-অভুক্ত-অর্ধভুক্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ থাকুক বা না থাকুক তাদের চুলায় নিম্নতম প্রয়োজনমত খাবার থাকতেই হবে। সরকারি পরিসংখ্যানুযায়ী এসব মানুষের সংখ্যা ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে কমপক্ষে ৩ কোটি ৪০ লাখ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন "দিন আনে দিন খায়" মানুষের কাজ থাকবে না তখন এসব মানুষের সংখ্যাটা দাঁড়াবে আনুমানিক ৬ কোটি। অর্থাৎ এরা হলেন দেশের মোট খানার আনুমানিক ৩৭ শতাংশ। এই ৬ কোটি মানুষ বাস করেন আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ খানায়। যার মধ্যে গ্রামে ১ কোটি খানা আর শহরে ৫০ লক্ষ খানা।

যদি করোনাভাইরাস-১৯ অপ্রতিরোধ্যভাবে চলতে থাকে এবং জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হয় তাহলে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে খাবার সরবরাহ সম্ভব হবে না। আসা যাক কিছু হিসেবের কথায়। মূল কথা হল এসব দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত প্রতিটি মানুষকে খাদ্য বাবদ দৈনিক কমপক্ষে গড়ে ৭৫ টাকা বরাদ্দ করতে হবে (হিসেবটি করা হয়েছে খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর দারিদ্র্যের নিম্নরেখার সাথে মূল্যস্ফিতি যোগ করে)। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন সারা দেশে লাগবে ৪৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ মাসে ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছয় মাস চালাতে হলে লাগবে ৮১ হাজার কোটি টাকা। অবশ্য অনিশ্চিত এ অবস্থা পরিবর্তিত হলে অথবা নীতিগত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলে এ অঙ্ক কম-বেশি হতে পারে। উল্লেখ্য যেখানে শিল্প মালিকদের জন্য আপাতত ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আর্থিক ও নীতি সুবিধাসহ আরো অনেক সুবিধে দিতে হবে সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অভুক্ত-অর্ধভুক্ত মানুষ বাঁচাতে তাদের মধ্যে খাদ্য বাবদ ছয় মাসের জন্য ৮১ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ যে কোনো বিবেচনায় ন্যায্য বরাদ্দ। আবার ঐ বরাদ্দ ফল কিন্তু পরবর্তীকালে পুঁজির মালিকরাই আনুপাতিক বেশি হারে ফেরত পাবেন কারণ তাদের দরকার হবে সুস্থ শ্রমিক। আর ঐ সুস্থ শ্রমিকরাই দেশজ উৎপাদন বাড়াবেন এবং একই সাথে সত্যিকার অর্থে সুস্থ থাকলে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে–বাড়বে প্রবৃদ্ধি। শেষ বিচারে আনুপাতিক হারে এ সবের বেশি অংশের ফল ভোগ করবেন পুঁজির মালিক ও তাদের স্বার্থবাহীরা।

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়াতে জরুরি খাদ্য সরবরাহ নিয়ে দুটো বিষয় নির্ধারণ জরুরি। প্রথমত, যেসব খানা খাদ্য বরাদ্দপ্রাপ্তি যোগ্য তাদের তালিকা প্রণয়ন; দ্বিতীয়ত, তালিকাভুক্ত খানার মধ্যে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বরদাস্ত না করা। দুটো কাজই গুরুত্বপূর্ণ এবং হতে হবে তুলনামূলক অভিযোগবিহীন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এ বিষয়ে জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–এখনই। তালিকা প্রস্তুতের নীতিমালা হতে হবে জনগণের কাছে সহজবোধ্য, গ্রহণযোগ্য এবং সময় নির্ধারিত। তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত মত হলো গ্রাম এবং শহরে যেসব খানা নারীপ্রধান যার প্রায় শতভাগই আর্থিকভাবে দুর্বল ও ভঙ্গুর তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তালিকাভুক্ত হবেন (তবে কেউ সংগত কারণে এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না চাইলে তাকে বাদ দেয়া উচিত), তালিকাভুক্ত হবেন সরকারি হিসেবের সব দরিদ্র খানা, সে সব খানা যাদের কোনো সদস্য মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে পারেননি অথবা পারছেন না, এবং সেসব খানা যাদের নিজস্ব মালিকানায় কোনো আবাসন নেই এবং গৃহহীন খানা, শহরের বস্তিবাসী এবং ভাসমান মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের সংশ্লিষ্ট অংশ, করোনা আক্রান্ত অথবা সম্ভাব্য আক্রান্ত সকল দরিদ্র খানা, চর-হাওড়-বাওড়-এর মানুষ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এবং যারা ইতোমধ্যে বয়স্কভাতাসহ অন্যান্য

ভাতাদি পাচ্ছেন তাদের বাদ না দেয়া। এ তালিকা প্রণয়নে দল-মত-গোষ্ঠী-সমাজ যেন কোনোভাবে প্রভাব না ফেলতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে সময়ক্ষেপণ করা যাবে না। তালিকাটি গ্রামে গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে দিতে হবে, মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। যোগ্য কেউ বাদ পড়লে প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ তালিকা প্রণয়নে কালক্ষেপণ ও গাফিলতি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং শাস্তির বিধান থাকতে হবে।

এর পরের প্রশ্ন– তালিকাভুক্ত মানুষের কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা খাবার কিভাবে পৌঁছাবে? বরাদ্দকৃত অর্থ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং অথবা প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে হবে যে একই খানার জন্য যেন শুধুমাত্র একটি (একাধিক নয়) মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও ফলপ্রদ সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী অথবা সামাজিক সেফটি নেট কর্মসূচীর মাধ্যমে যে শতাধিক ধরনের বরাদ্দ মানুষের কাছে পৌঁছায় সেটা অনুসরণ করা যেতে পারে। খাদ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অথবা বরাদ্দকৃত খাদ্য সরাসরি পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে শক্তিশালী বিলি-বণ্টন ও মনিটরিং ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ নেবেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট জনগণের সেবা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, নাগরিক সমাজের নারী-পুরুষ প্রতিনিধি, সেনাবাহিনীসহ নিরাপত্তা-শৃংখলা ও আইনী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। কেন্দ্রিয়ভাবে রিপোর্ট যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীতি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে যিনি প্রতিনিয়ত এ বিষয়ে সরাসরি রিপোর্ট করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও চিফ অব কমান্ড হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানীত ব্যক্তিটি হবেন চিফ অব অপারেশনস। অর্থাৎ সমগ্র মেকানিজম হবে মোটামুটি "করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধ" কার্যক্রম যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে ঠিক একই ধরনের গুরুত্ব দিয়ে।

এখন প্রশ্ন অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বাঁচাতে ছয় মাসের খাদ্য-সহায়তা বাবদ যে ৮১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ লাগবে তা কোথা থেকে আসবে? এ প্রশ্নের পাটিগাণিতিক উত্তর তেমন কঠিন নয়।

আমাদের চলমান ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেট ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা হল উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ যার মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা। মোট ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে সর্বমোট যে পরিমাণ উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয় তার সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ ব্যয় হয় প্রথম ১০ মাসে। আর পরের দুই মাস অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি প্রবল অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় মিস-এলোকেশন অথবা অপচয়। এ হিসেবে চলমান উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের কমপক্ষে ৪০ শতাংশ এখনও ব্যয় হয়নি। বরাদ্দকৃত অ-ব্যয়িত এ অর্থের মোট পরিমাণ হবে কমপক্ষে ৮৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। যদি ধরেও নিই যে আগামী দুইমাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অথচ অ-ব্যয়িত একাংশ ব্যয় হতেই হবে (যেমন খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ন, মহিলা ও শিশু, জনশৃংখলা) সেক্ষেত্রেও বর্তমান জরুরি অবস্থায় ওই অ-ব্যয়িত অংশের সর্বোচ্চ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়কে যুক্তিসঙ্গত ব্যয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ তার পরেও হাত থাকবে ৭৪ হাজার ৬৭৩ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে যে কাজটি করা প্রয়োজন বলে মনে করি তা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই উল্লেখিত ৬২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে খাত-উপখাতওয়ারি এ তথ্যাদি জেনে নিন যে প্রত্যেকের কাছে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অথচ এখনও ব্যয় হয়নি এমন অর্থের পরিমাণ কত; নির্দেশনা দিন আগামী ২ মাসে ব্যয় না করলেই নয় এমন খাত-উপখাতগুলো কি কি এবং সংশ্লিষ্ট যুক্তি। দেখবেন অর্থের অভাব তো হবেই না, বরঞ্চ অর্থ বছরের শেষের দিকে 'ভাউচার বানানোর সংস্কৃতি' উল্টে যাবে। এটাও তো হতে পারে কোভিড-১৯-এর কারণে বহুদিনের পচনশীল বাজেট বাস্তবায়ন সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। এ সবের পাশাপাশি দেশের মধ্যেই সরকারি রাজস্ব অর্থাৎ অর্থ-আহরণের বহু উৎস আছে যাতে কখনো হাত দেয়া হয়নি, যেমন গত বাজেট বক্তৃতায় (২২১ অনুচ্ছেদে) মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন "বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই...। অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন

কোনো আয় প্রদর্শন করেন না"। একইসাথে সামনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ এবং প্রতিরোধ-পরবর্তী সময়ে খাদ্য-সহায়তা, কর্মসৃজন-সহায়তা, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়তার লক্ষ্যে বহু ধরনের বৈশ্বিক তহবিল গঠিত হবে। আগেই বলেছি জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমরা এসব তহবিলের ৩ শতাংশ হিস্যা পেতে পারি। তাহলে অভুক্ত-অর্ধভুক্ত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ৬ মাসের খাদ্য সহায়তা বাবদ ৮১ হাজার কোটি টাকা আহরণ আদৌ কোনো কঠিন কাজ হবে না।

আগেই বলেছি মানুষের 'কাজ' না থাকলে 'দিন আনা দিন খাওয়া' বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে করি 'কাজ' নিয়ে নিরাশ না হয়ে পথ-পন্থা খুঁজতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় কেইনসীয় সমাধান পথ যথেষ্ট কার্যকর। আর তা হল অবস্থা একটু উন্নতির দিকে গেলে গ্রাম-শহরে ব্যাপক সরকারী বিনিয়োগে পাবলিক ওয়ার্কস ধরনের কর্মকাণ্ড চালু করা। হতে পারে তা রাস্তার কাজ, নির্মাণ কাজ, নদী খননের কাজ, পুকুর-দিঘী খননের কাজ, স্কুল ঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। কাজ আবিষ্কার-উদ্ভাবন করতে হবে। কাজ নিয়ে উদ্ভাবনের স্বরূপ সময়ই বলে দেবে।

আরও একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া জরুরি। তা হলো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো ধরনের সিন্ডিকেশন বরদাস্ত না করা। অতীতের ইতিহাস বলে সিন্ডিকেটওয়ালারা বিভিন্ন অজুহাতে অযথা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরা মূল্য বাড়িয়ে বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন। ফলে মানুষ দরিদ্রতর হয় এবং বৈষম্য বাড়ে। করোনা আক্রান্তকালে ও পরবর্তী কিছুকাল এসবের সম্ভাব্য মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে যদি শক্ত হতে তা দমন না করা যায়। এ ধরনের সবকিছু ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। আর এ সবের পাশাপাশি এ মুহূর্তে (মার্চ-এপ্রিল) যে সব চৈতালি ফসল মাঠে আছে অথচ কৃষক হাটবাজারে বিক্রি করতে পারছেন না, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, মসুর ডাল, গম, মরিচ আর সামনে (মে মাসে) যে ফসল উঠবে যেমন ভুট্টা, ধান ইত্যাদি সেসব যেন সরকার কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে তার ব্যবস্থা করা। মধ্যস্বত্বভোগিদের দৌরাত্ম্য দূর করার এটাও এক সুযোগ। অন্যথায় কৃষক আবারও মধ্যস্বত্তভোগীদের অধীনস্থ হবে আর রাজত্ব করবে সিন্ডিকেটওয়ালারা। এ সবই দমন করতে হবে–কঠোর হাতে।

আমার প্রস্তাবিত 'মানুষ বাঁচাও' কল্পচিত্র কর্মসূচিতে আরো দু'একটা বিষয় বলে রাখা জরুরি: কৃষি খাতকে সবচেয়ে অগ্রাধীকারযোগ্য খাত হিসেবে বিবেচনা করে তদনুযায়ী যতদিন করোনাভাইরাস ও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আমরা মুক্ত না হচ্ছি ততদিন কৃষিখাতে সব ধরনের উৎপাদন প্রণোদনা থেকে শুরু করে ঋণ মওকুফ, ক্ষুদ্র ঋণের সুদ মওকুফ, স্বল্প সুদে অথবা ক্ষেত্র বিশেষে বিনাসুদে কৃষি ঋণ প্রদানসহ কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির সকল কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে চালু রাখতে হবে। আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে করোনাভাইরাস-১৯-এ আক্রান্ত হবার আগেই শুরু হয়েছে। আগামি বাজেটে করোনা ভাইরাস-১৯ এর ঘাত-প্রতিঘাতসহ সংশ্লিষ্ট 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচীর অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। সেক্ষেত্রে বাজেটের প্রচলিত-গতানুগতিক কাঠামো পরিবর্তীত হবে। অর্থনীতি আবারও জেগে উঠবে কিন্তু ভঙ্গুর হয়ে পড়বে অনেক খাত-ক্ষেত্র-শিল্প-ব্যবসা।

ইতালিসহ কিছু দেশে ব্যাংকিং সংকটের আশঙ্কা আছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনার আঘাত ব্যাপক এবং ক্রমবর্ধমান একই সাথে এ মুহূর্তে ৩০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক বেকারত্ব-ইন্সুরেন্স দাবি করছেন–যা বাড়বে; গণচীনে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৩.৫ শতাংশ কমেছে; যুক্তরাজ্যে করোনার আঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে–সব মিলিয়ে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে; সম্ভবত পরিবর্তীত হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমীকরণ ও মেরুকরণ। আমরা এসব ঘাত-প্রতিঘাত-অভিঘাত থেকে মুক্ত নই। সুতরাং আমাদেরও ভাবতে হবে– কঠিন ভাবনা কারণ 'অনিশ্চয়তার' মধ্যে সুস্থ ভাবনা শুধু মানসিকভাবেই নয় যৌক্তিক কারণেই সহজ নয়। জটিল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথরেখা বিনির্মাণে ধৈর্য, সততা ও জ্ঞান-বুদ্ধির সম্মিলনের বিকল্প নেই। আমরা এখন যে সময় পার করছি তার প্রাক-অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অনিশ্চিত সময়টা হল "ডিজিটাল সংযোগের যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট।" সুতরাং

মানব উন্নয়ন সংশিষ্ট সকল চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি মূল নীতি-কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার আপাত শেষ কথা: করোনাভাইরাস-১৯ প্রতিরোধে 'মানুষ বাঁচাও' কর্মসূচির যে কল্পচিত্র প্রস্তাব করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় যৌক্তিক। কারণ একদিকে যেমন মানুষকে ভাইরাস থেকে প্রতিরোধ করতে হবে তেমনি অন্যদিকে কোনোভাবেই দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি করা যাবে না এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে উন্নয়নের চাকা দ্রুত ঘোরাতে হবে। আমরা এসব মোকাবেলায় সক্ষম। কারণ আমাদের নেতৃত্বের শিখরের ব্যক্তিটির মানবিক দায়বোধ সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এসব মোকাবেলা করতে সক্ষম হলে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সমন্বয়-প্রভাব বা স্পিল ওভার ইফেক্ট হবে উচ্চ মাত্রায় ধনাত্মক; শ্রম ও পুঁজির বাইরে উন্নয়নে আরো যেসব উপাদান কাজ করে তার প্রভাব হবে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি যাকে অর্থনীতিবিদরা বলেন মোট উপকরণ উৎপাদনশীলতা; মোট দেশজ উৎপাদন-এর ভাবনা জগতে নির্ধারক স্থান করে নেবে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি অথবা জীবন-কুশলতা; অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদি ফ্যাক্টরের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ফ্যাক্টর বেশি প্রভাব ফেলে– আমরা সেদিকেই এগুবো; এবং সর্বশেষ কথা আমাদের দেশে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যা প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত হয়নি সে সব গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াসম্বলিত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে ফলে সুশাসন নিশ্চিত হবে, নিশ্চিত হবে শুধু জবাবদিহিতা নয় মানবিক দায়বদ্ধতা। শেষ বিচারে আমরা অবশ্যই পারবো এমন এক সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতি বিনির্মাণ করতে যা "আত্মতুষ্ট সভ্যতার প্রতি প্রকৃতির ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান"-এ দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম, যা সম্ভাব্য দ্রুততার সাথে "ডিজিটাল যুগে মহামারি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট" কাটিয়ে উঠতে সক্ষম, এবং যা শেষ বিচারে প্রকৃতির প্রতি আস্থা-সম্মান রেখে মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি ও জীবন-কুশলতা বাড়াতে সক্ষম।